BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, V-15, N-23 (2019)

দেওবন্দ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিকাশধারা: একটি পর্যালোচনা

মোসা: ফাতিমা আক্তার*

দেওবন্দ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির (৩ মার্চ ৬২৮ খ্রীঃ) পর অভ্যন্তরীণ স্বস্তি অনুভব করে বহিঃর্বিশ্বে ইসলামের দাও'য়াত প্রেরণ করায় মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন পৃথিবীতে যে-কয়টি রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে মহানবী (সা.) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস[১], পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ[২], মিশরের শাসন কর্তা আবীস মিসর[৩], হাবসার রাজা নাজ্জাশী[৪], ইয়ামামার সরদার[৫] বৃন্দ এবং সিরিয়ার গাস্সানী শাসক হারিস[৬] প্রমূখের নিকট পত্রসহ দূত প্রেরণ করে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দেন।[৭]

'হিন্দ' তথা ভারত উপমহাদেশে দা'ওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর দরবারে আলোচনা হওয়ার প্রমাণ হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে ভারতে দা'ওয়াত পৌঁছানোর প্রতি তাগিদ দিয়ে বলেন:

---

* এম. ফিল গবেষক,দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ , ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় , কুষ্টিয়া

১ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তীর্থ করার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে আসলে সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) হিরাক্লিয়াসকে প্রসিদ্ধ সাহাবী দিহদিয়া কালবী-এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াতপত্র প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটির সাথে উপঢৌকন স্বরূপ বহু স্বর্ণ মুদ্রা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে প্রেরণ করেন। পত্র পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সে ইসলাম গ্রহণ করেনি, বরং খ্রীষ্টানই রয়েগেছে। সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তার প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রী গরীব ও নিঃস্বদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। পরবর্তীকালে মু'তা অভিযানের সময় সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে তার মুসলমান না হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের আলোতে হিরাক্লিয়াসের অন্তর উদ্ভাসিত হয়েছিল বটে : কিন্তু রাজ্য লিপ্সার কারণে হতভাগ্য চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। লোভ-লালসা, প্রতিপত্তি প্রিয়তা এবং দুনিয়ার মোহ অতিক্রম করতে না পারলে কেউ কোনদিন মুক্তির পথ অবলম্বন করতে এবং আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারেনা। দ্র. মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল -কুশায়রী, সহীহ-মুসলিম, (দিল্লী : মাকতাবায়ে রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ৯৭-৯৯।

২ কিসরাঃ পারস্য সম্রাট পারভেজ এর উপাধি ছিল কিসরা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী ও উদ্ধত স্বভাবের লোক। তাঁর সময়ে পারস্যের রাজদরবার যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, ইতোপূর্বে আর কখনও সেরূপ হয়নি।

৩ মুকাওকিসঃ মিসরের রাজার উপাধি ছিল মুকাওকিস। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে মুকাওকিসের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাঁর নাম ছিল জুরায়েজ ইবনে মতী। মতান্তরে তাঁর নাম ছিল 'বিনয়ামিন'।

৪ নাজ্জাসীঃ আবিসিনিয়ার সম্রাটের উপাধি ছিল নাজ্জাসী। নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার উৎপীড়িত মুসলমানগণ হিজরত করতে গিয়ে ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নাজ্জাসীর নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নাজ্জাসীর প্রকৃত নাম ছিল 'আসমিহা'।

৫ ইয়ামামা সরদার ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের আহবানপত্রসহ ইয়ামামার সরদার হুযার নিকট দূতরূপে হযরত সলীতকে প্রেরণ করেন। সরদার হুযা হযরত সলীতকে যথেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেন।

৬ হারিস গাসসানী ঃ হারিস গাসসানী সিরিয়া সীমান্তে রোমের অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন। মহানবী (সা.) হারিস গাসসানীর নিকট ইসলামের আহবানপত্রসহ রাবর গুজাকে প্রেরণ করেন।

৭ শায়খুল হাদীষ মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, ড.এ.এইচ. এম. মুজতবা হোসাইন, (সম্পা) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮) পৃ. ৬৮১।

قال رسول الله ﷺ : عصابتام من أمتى حررکا لشمن النار مصابه تفزو لحضد وعطابة تکوه مع عيسى بن مريم عليها السلام

"আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিস্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি হল 'হিন্দ' অভিযানকারী সেনাদল আর অপরটি হল মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) এর সহযোগী সেনাদল।[৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) 'সরবতর্ক' নামক ভারতের জনৈক রাজাকে হযরত হুযায়ফা, উসামা ও সুহাইব (রা.) নামক তিনজন সাহাবীর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তিনি (রাজা) ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূল (সা.) এর জন্য ভারত থেকে আদা (এরহমবৎ) উপহার পাঠান।[৯]

উল্লেখ্য যে, এতদভিন্ন আরও কতিপয় 'আরব সরদারের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.) আহবানপত্র (দা'ওয়াত নামা) প্রেরণ করেছিলেন। শায়খ যায়নুদ্দীন স্বীয় 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' গ্রন্থে বলেন, মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়।[১০] তিনি উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন, হিন্দু রাজা 'চেরুমাল পেরুমাল'।[১১] স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে তাওহীদী চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে আরবে গমন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২] এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামের দা'ওয়াত ভারতবর্ষে পৌঁছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনমলে (৬৩৪-৬৪৪ খৃ) সিন্ধুর সাথে আরবদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।[১৩] সাহাবীগণ ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য একযোগে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। সারা বিশ্বে ইসলামের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। যার ফলশ্রুতিতে মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর মাত্র বার বছরের মধ্যে তাঁর একদিকে নীল নদের অপর প্রান্ত এবং অন্যদিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেন।[১৪] তখন যে কয়েকজন সাহাবী উপমহাদেশে পদার্পণ করেন তাঁদের নাম যথাক্রমে

---

[৮] সুনান লিল ইমাম আন-নাসায়ী, (দেওবন্দ: দারুল কিতাব, হি ১৩৫০), ২য় খন্ড, "গাযওয়াতুল হিন্দ", পৃ. ৫।

[৯] ড.এ.কে.এম নূরুল আলম, ইসলামী দা'ওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য, (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২) পৃ. ১৩৯।

[১০] আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২), পৃ. ২৮।

[১১] চেরুমাল পেরুমাল : তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সন তারিখ জানা যায়নি। ইসলাম গ্রহণের পব নতুন নাম ধারণ করেছিলেন আবদুর রহমান সামরী।

[১২] দীন মুহাম্মদ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯১৩), পৃ. ১৭৬; মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বাংলা ও বাঙালী: মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, (ঢাকা: সজনী প্রকাশনী), পৃ.১০৪।

[১৩] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০।

[১৪] ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (অনু), ইলমে হাদীস ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩). পৃ.১৩।

আবদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইতবান,[১৫] আমর আত-তামীমী,[১৬] সুহাব ইবনুল আদাবী,[১৭] সুহায়ল ইবন আদী[১৮] এবং হাকাম ইবন আবুল আস-সাকাফী[১৯]। খলিফঅ হযরত উসমান (রা.) এর শাসনমলে আগমনকারী দু'জন সাহাবী ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মার আততামীমী[২০] ও আবদুর রহমান ইবন সামুরা আল বসরী।[২১] ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে বহু সূফী-সাধক ও উলামা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব থেকে ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন।

---

[১৫] আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ আতবান (রা.) মদীনায় আনসারদের একটি গোত্র বনুল হুবলার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ২১ হিঃ / ৬৪১ খৃ. সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস স্থলে কুফার গর্ভণর নিযুক্ত হন এবং সে বছরের শেষ ভাগে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি পূর্ব ইরান ও উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন। তাঁর ইন্তেকালের তারিখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। (ইবন হাজার আসকালানী, আল ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা, মিসর, মাতবাউস সা'আদাহ, হিঃ ১৩২৮, ২য় খন্ড, পৃ.৩৩৭।

[১৬] আসিম ইবন আমর আত-তামীমী রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবী এবং প্রাথাকি যুগের একজন খ্যাতিমান সৈনিক ছিলেন। ইরাক বিজয়ে তিনি বিশ্ব বিশ্রুত জেরারেল (সেনাপতি) হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের সাথে শরীক থেকে মুক্ত যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম আরব জেনারেল, যিনি হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যাকা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। (ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭। ইবন আবদিল বার, আল ইস্তিআব ফী মারিফাতিল আসহাব, (মিসর: মাকতাবাহ নাহদাহ, তা.বি) ২য় খন্ড, পৃ. ৭৮৪।

[১৭] সুহার ইবনুল আদাবী (রা.) ছিলেন আব্দুল কায়স গোত্রের লোক। ৮হিঃ / ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হুজর থেকে মদীনায় আগমন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমরের খিলাফতকালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্ধুদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেন, তা থেকে বোধগম্য হয়ে যায় যে, এখানকার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন। তিনি হযরত উসমান (রা.) এর সমর্থক ছিলেন। দ্র: ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

[১৮] হযরত সুহায়ল ইবন আদী (রা.) ছিলেন আযদ গোত্রের শাখা বনুল আশহালের সাথে সম্পৃক্ত লোক। তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সরাসরি প্রমাণ যায় না। তবে তিনি ১৭ হিঃ / ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আল-জাযীরার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীগণের তালিকাভুক্ত তার হওয়ার মত বয়স ছিল। সুহায়লের অন্যান্য ভ্রাতাগণ রাসূল (সা) এর অত্যন্ত অনুগত সাহাবী ছিলেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের নাম পর্যায়ক্রমে হযরত হারিস ইবন আদী, হযরত আব্দুর রহমান ইবন আদী এবং হযরত সাবিত ইবন আদী। দ্র: ইবন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

[১৯] হাকাম ইবন আবুল আস-সাকাফী বসরার হিজরতকারীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মুআবিয়া ইবনে কুররা আল-মুযানী (মৃত্যু ১১৩ হিঃ) তাঁর কাছে থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সকীফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই গোত্রের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ১১ হিজরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। দ্র. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[২০] হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন মামার আত-তামীমী (রা.) ছিলেন মদিনার বাসিন্দা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারীও ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁকে মাকরুন ও সিন্ধু এলাকায় বিদ্রোহী উপজাতিদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। আল্লামা তাবারীর বর্নিত ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান (রা) ২৩ হিজরীতে খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরই তাঁকে মাকরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। মাকরানে পৌঁছে তিনি বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের করতলগত করে নেন। দ্র. ইবর হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

[২১] হযরত আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা.) কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান। আগে তাঁর নাম ছিল আবৃদ কিলাল বা আবদুল কা'বা । ৯ হিজরী /৬৩০ সালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হন এবং নবী (সা.) থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত ইব্ন আববাস, সাইয়িদ ইবন আল মুসাবি, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, আবদুর রহমান, ইবন আবী লায়লা

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়ে যে, ভারত বর্ষের আদি বাসিন্দা ছিলেন হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.) এর অধঃস্তন বংশধরগণ। পবিত্র কুরআনে হযরত আদম (আ.) কে আদি মানব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২] তিনি ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম পয়গাম্বর।[২৩] বেহেশত হতে বের হয়ে আদম (আ.) সরন্দীপে (লঙ্কায়) অবতরণ করেন।[২৪]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) এর তিন পুত্র ছিল যথাক্রমে হাম, সাম, ইয়াফিস।[২৫] প্রথম পুত্র হামের ছিল ছয় পুত্র যথাক্রমে হিন্দ, সিন্দ, হাবাস, জানাস, বার্বার ও নিউবাহ। প্রথম পুত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষ আবাদ হয়েছিল বলে এ ভূখন্ড 'হিন্দ' বা হিন্দুস্থান নামে অভিহিত।[২৬]

নূহ (আ.) এর পুত্র ও পৌত্রদের সকলে ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী ইসলাম প্রচারক। হিন্দের চার পুত্র যথাক্রমে পূরব, বঙ্গ, দাকন, ও নাহ্ রাওয়াল। জ্যৈষ্ঠপুত্র পূরবের ছিল ৪২ প্রত্র। অল্প কালের মধ্যে তাঁদের আরো বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং তাঁরা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গ উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই বঙ্গ বংশধরের আবাসস্থলই বঙ্গ বা 'বাংলা' নামে পরিচিত।[২৭]

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণের ফলে ক্রমে ক্রমে সেখানে মুসলিম শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ইসলাম প্রচারকদের ক্রমাগত অভিযান সেই ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করে তোলে। ফলে শতাব্দীকালের মধ্যেই উপমহাদেশের পশ্চিম উত্তর সীমানায় উড্ডীন হয় মুসলিম শাসনের পতাকা। এ ব্যাপারে মুসলিম রাজন্যবর্গের চেয়ে ইসলাম প্রচারকদের অবদানই বেশী ছিল।[২৮] মুসলিম প্রচারকবৃন্দ ভারতে এসে

এবং হাসান আল বসরীর উস্তাদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তার থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ বুখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৩১ হিজরী/৬৫০ সালে তিনি 'সিস্তানের' গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ সেনাপতি ছিলেন। কার্যভার গ্রহণের পরই বরঞ্জ থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা অধিকার করেন । তিনি হেলমন্দ নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে রুদবার পর্যন্ত জয় করেন। এ স্থানটি বর্তমানে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্থানের সীমান্তে অবস্থিত। তিনি ৫০ হিজরী মোতাবেক ৬৭০ সালে বসরায় ইন্তেকাল করেন। দ্র. ইবন সাদ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮।

[২২] আল কুরআন ২: ৩০-৩১।

[২৩] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ.১৫।

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[২৫] মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা, (অনু) আব্দুল হাই, তারিখে ফেরেশতা, (দেওবন্দ : মাকাতিবায়ে মিল্লাত, ১৯৮৩), পৃ.৫১; ড.এ.কে.এম. নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[২৬]

[২৭] আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ে এক মহাপ্লাবন সংগঠিত হয়। এ উপহাদেশও উক্ত পাবন থেকে বাদ পড়েনি। মাত্র ৮৫ জন মতান্তরে ১৬০ অথবা ১৮০ জন ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত। বিপথগামী মানুষ এ মহা প্লাবণে ধ্বংস হয়। হযরত নূহ (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল হাম, হামেরই পুত্র হিন্দ। হিন্দের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'বং'। বং এর সন্তানেরা এতদঞ্চলে বসতি স্থাপন করায় এ জনপদ বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ১ম খন্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২.১০।

[২৮] ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেমদের অবদান।", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০০৩, পৃ.৮।

ভারতীয়দের সাথে একান্তভাবে মিশে যান। তারা ভারতবাসীর সাথে ঘনিষ্ট মেলামেশার মাধ্যমে ইসলামের পবিত্র বাণী, আখলাক ও দৈনন্দিন জীবন বিধানের দাওয়াত শিক্ষা দেন। তারা সাধারণত কোন গ্রাম বা নগরকে নিজেদের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়ে সেখানে খানকা ও প্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলতেন। ভারতের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশকে তারা এত আপন করে নিয়েছিলেন যে, অনেকে নিজ জন্মভূমিতে আর ফিরে যাননি বরং এখানেই সমাধিস্থ হন।[২৯]

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন উমাইয়া সেনাপতি মুহাম্মদ ইবন কাসিম তার এ সূচনা অভিযানে ৪০০০ ভারতীয় জাঠ সৈন্য সহযোগী হয়েছিল বলে জানা যায়। পথিমধ্যে তিনি পুরাতন ব্রাম্মনাবাদ[৩০] জয় করে যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সাওয়ান্দা বাসীরাও তাঁর সাথে মিলিত হয়।[৩১] তিনি যে নগর জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের ইবাদত ও শিক্ষার জন্য মসজিদ নির্মাণ করতেন।[৩২] তারপর যথাক্রমে সুলতান মাহমুদ গযনবী, মুহাম্মদ ঘোরী ও কুতুবুদ্দীন আইবেক বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন। মুসলিম শাসনের এই ধারা মুঘলদের পতন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৩৩] পরবর্তীতে ইংরেজরা ভারত বর্ষে আগমন করে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ গোষ্ঠী ভারতবর্ষে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আগমন করেনি বা কোন আদর্শের পয়গাম নিয়েও আসেনি। তারা এসেছিল নিছক ক্ষমতা, বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। তারপর ভারতীয় রাজন্যবর্গের দূর্বলতার সুযোগে কূট-কৌশলে উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে যায়।[৩৪] দীর্ঘ একশনব্বই (১৭৫৭-১৯৪৭) বছর তারা দেশের একটি অংশ বিশেষ থেকে শুরু করে গোটা ভূখন্ড শাসন করে। তন্মধ্যে একশ ১৭৫৭-১৮৫৭) বছর ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। আর নব্বই (১৮৫৭-১৯৪৭) বছর ছিল সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসন। মোটামুটি বলতে গেলে এই একশ'নব্বই বছরের ইতিহাস ছিল উপমহাদেশের ধনরত্ন ইউরোপে পাচার করা, হিন্দু মুসলিম

---

[২৯] সাধারণত: বলা হয়, এক হাতে কুরআন আর এক হাতে তরবারী নিয়ে পৃথিবীতে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়েছে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয়। তবে মুসলিমদের দেশ বিজয়ের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মেরও প্রচার-প্রসার ঘটেছে। উল্লেখ করা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইহজীবনকানে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের যে সব যুদ্ধ হয়, তার প্রায় সবগুলোই ছিল আত্মরক্ষামূলক। এমনকি যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও শত্রু পক্ষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কালে এবং তার পরও ইসলামের এ মূল শিক্ষা অব্যাহত থাকে। যুগে যুগে এরই অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সাম্যের আদর্শের প্রতি সকলকে আহবান করা হয়েছে। এ উদার মনোভাবের কারণেই ইসলাম সহজেই প্রসার লাভ করেছিল। ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এখানে কোথাও জবরদস্তির প্রমাণ নেই। মূখ্যত সূফী দরবেশ ও উলামায়ে কিরামই ইসলাম প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করেন।

[৩০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারত বর্ষের ইতিহাস, (ঢাকা : ১৯৮৯), পৃ.২৩।

[৩১] আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

[৩২] ড.এ.কে.এম. নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

[৩৩] ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

[৩৪] এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪), ৪র্থ প্রকাশ, পৃ. ১২ - ১৩।

নির্বিশেষে ভারতবাসীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক ও সাম্প্রদায়িকভাবে পর্যন্ত করা এবং ভারতীয় জীবনযাত্রা, শিক্ষা, উৎপাদন, কৃষি, কারিগরি, শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করে দেশে অদক্ষতা, খাদ্যাভাব, দারিদ্র, বেকারত্ব, দূর্নীতি ও দূর্ভিক্ষ সৃষ্টির ইতিহাস।[৩৫]

ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিপন্ন করার পাশাপাশি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী তাদের ন্যূনতম নাগরিক অধিকার এবং তাদের আত্মসম্মানও ভূলুণ্ঠিত করেছিল। সাধারণ কাজকর্ম থেকে বিচার বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র ফিরিঙ্গী ও ভারতীয়দের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান করা হয়।[৩৬] ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবাসীকে নিজেদের যথেচ্ছা ব্যবহারের উপযুক্ত গোলামে পরিণত করে এবং চরম অপমানিতের জীবন যাপনে বাধ্য করে। ঐ অপমানের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, "আত্মসম্মানের আঘাত একটি অতি অপ্রিয় বস্তু। এতে করে একজন মানুষের হৃদয় ভেঙ্গে যায় এবং তার পরিণাম হয়ে উঠে অত্যন্ত মারাত্মক । ইংরেজগোষ্ঠী ভারতীয়দেরকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীনে পরিণত করে। প্রজাবৃন্দ সাহেবের পেশকারের (পি.এ) রুক্ষতা, কদর্য আচরণ ও গালি গালাজ শুনে আর মনে মনে ক্রন্দন করে বলে, এই চাকুরী করা থেকে বনে গিয়ে ঘাস কাটা উত্তম। ইংরেজদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে কোন ভদ্রলোকের বসবাস নেই।"[৩৭]

ভারতের পুরাতন শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রতি সরকারের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ মনোযোগের কারণে ভারতীয় পন্ডিতগণ অংক, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে তদানিন্তন বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টোল, চতুস্পাটি, মাদরাসা ও পাঠশালার ব্যবস্থা ছিল।[৩৮]

১৯০৪ সনে সরকারী ভাবে প্রকাশিত Indian Education Policy গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'Schools were attached to Mosque and Shrines and Supported by state grants in cash or land by private liberality. The course of study in a Mohammadan place of learning included grammar, Rhetoric Logic, literature, Jurisprudence and science. Both systems, the Mohammadan No less than the Hindu, assigned a disproportionate importance to the training to memory and sought to develop the critical faculties of the mind, mainly by exercising their pupils in meth a physical refinements and in fine spun commentaries on the meaning of the text which they had learnt by heart.'[39]

---

[৩৫] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (১৯৯২), পৃ.১৩।

[৩৬] কোম্পানীর আমলে একজন ভারতীয় কর্মচারীর তুলনায় একজন ইংরেজ কর্মচারীকে বেতন দেয়া হয় ২০ গুণ বেশী।

[৩৭] স্যার সৈয়দ আহমদ খান, ভারতে বিদ্রোহের কারণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৪৪-৪৫।

[৩৮] ড. অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, (কলিকাতা: মল্লিক লাইব্রেরী, ১৯৮১), ২য় খন্ড পৃ. ১২০।

[৩৯] দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের ব্যথা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৮১।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষার সকল স্তর ছিল অবৈতনিক। মুসলিম শাসকমন্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। পন্ডিত লালা লাজপৎ রায়ের মতে তৎকালে ভারত বর্ষে শিক্ষিতের হার ছিল ৫১%, যা ইংরেজ শাসনামলে ২% এ নেমে আসে। এ প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ লিখেছেন, ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশেই ৮০ হাজার মাদরাসা ছিল। এর অর্থ, তখন প্রতি শত মানুষের জনপদে একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনো ভারতের ঐ সকল স্থান, যেখানে পুরাতন নিয়মের শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে, সেখানকার শিশুদের প্রায় সবাই লিখতে ও পড়তে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশ সহ যে সকল স্থানে পুরাতন শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, সেখানকার গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[৪০] ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার দরুন বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এদেশের মুসলমানগণ। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কুশাসন ও মুসলমানদের প্রতি তাদের চরম বৈরী আচরণ মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণ বিপন্ন করে দেয়। ফলে যে মুসলমান শাসক বর্গ শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করে আসছিলেন, তারা মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে অধ:পতনের চরম সীমায় পৌছে যায়।[৪১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, W. W. Hurter observed in about 1870: A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born Muscleman in Bengal to become poor, at present it is almost impossible for him to continue rich. The truth of this statement will be evident from the account of the conditions of the Muslims under the British rule.[42]

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সরকার মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাকে ক্রমে ক্রমে দুর্বল বা ধ্বংস করে দেয়ার গভীর চক্রান্তের অংশ বিশেষ ইউরোপীয় স্বার্থ উপযোগী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই ইংরেজী শিক্ষাবে মুসলমানরা তাদের স্বার্থ ও সামাজিক ঐতিহ্যের পরিপন্থীরূপে গণ্য করে আসছে। স্কুলগুলিতে যে ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো - তাতে হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির আধিপত্য ছিল। কারণ শিক্ষকরা ছিলেন সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সংগত কারণে মুসলমানরা পৌত্তলিক ভাবধারার প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করেছেন। যার ফলে ভারত বর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে পড়ে।[৪৩] সমকালীন মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই ইংরেজ আমলে মুসলিমদের দূর্দশার ও অবনতির জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উলামা ও রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের বিরোধিতাকে দায়ী করেছেন।[৪৪]

---

[৪০] আব্দুর রহমান, তাহরীকে রেশমী রুমাল, (লাহোর: কাসি উর্দু প্রেস, ১৯৬০), পৃ, ৭৭।

[৪১] ডঃ মুশতাক আহমদ, শায়খুল ইসলাম সায়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.), (১৮৭৯-১৯৫৭ খ্রীঃ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ৫১।

[৪২] Edited, Islam in Bangladesh Through Ages, (Dhaka. Islamic Foundation Bangladesh, 1995). P. 83.

[৪৩] মেসবাহুল হক, "কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও বাংলার মুসলমান", অধ্যাপক আব্দুল গফুর (সম্পা) আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৭।

[৪৪] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৩।

মুসলিম সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিসেবে ইতোপূর্বে আমীর উমারা ও নওয়াবগণ বহু সম্পত্তি লা-খারাজ দিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৩৮ সালে ইংরেজগণ এ সকল সম্পত্তি ক্রোক করে নিলে শিক্ষা ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮০৬ সালে হাজী মুহাম্মদ মহসিন মুসলিম শিক্ষার জন্য যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন, ইংরেজ আয়কর সেটি থেকেও মুসলমানদের বঞ্চিত করে। হুগলীর ইসলামীয়া কলেজকে ইংরেজী কলেজে পরিণত করা হয়।[৪৫] ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টারের মতে তখন ঐ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০০। তাদের মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল মাত্র ৩ জন।[৪৬]

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর বৈরিতা। এ বিরোধের উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালে মহাবিপ্লবের সময়। এ জন্য ইংরেজ সরকার মুসলমানদের দায়ী করে। বিশেষতঃ উলামা ও ধার্মিকদের। তাই আলিম ও ধার্মিক লোকদের উপরই প্রতিশোধ ও দমনমূলক নির্যাতন চালানো হয়। আলিমদেরকে বাড়ী থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহে প্রায় ২০ লক্ষ মুসলমান অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে দুই লক্ষ শহীদ হয়। ইংরেজগণ দিলীর ক্ষমতা পূর্ণ দখলের পর ২ সপ্তাহের ভিতরে ৫০ হাজার আলিমকে হত্যা করে।[৪৭] তাদের জমাজমি ও সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে অসংখ্য আলিমকে নির্বাসিত করা হয়। তাদের ফাঁসি দিয়ে হাটে-বাজারে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একযোগে ৬০ জন মুসলমানকে ঝুলিয়ে হত্যা করে তাদের লাশ মাসের পর মাস বৃক্ষের শাখায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। কোর্ট মার্শালে যে সকল অফিসার বিচারক নিযুক্ত হতেন তারা শপথ করতেন যে দোষী বা নির্দোষী বন্দীদের তারা ফাঁসির রায় দেবেন।[৪৮] প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আহমদ উল্লাহ, মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ বাদানী, মৌলভী আবদুল কাদির দেহলভী, মুফতী ইনায়েত আহমদ কাকুরী, মৌলভী ওয়াবীর খান আকবরাবাদী, কাযী ফয়েজ উল্লাহ দেহলভী, সাইয়িদ মুবারক শাহ রামপুরীসহ বহু আলিমকে ইংরেজরা মহাবিপ্লবের জন্য দায়ী করে।[৪৯]

প্রতিশোধের ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্তৃক মুসমানদের বিশেষত আলিমদের নির্মূল করার সুপরিকল্পিত ও আগ্রাসী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। দাড়ি টুপি বিশিষ্ট কোন লোক দেখা মাত্রই মৌলভী মনে করে গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হয়। মৌলভী বেশ-ভূষা সম্পন্ন মানুষ বিদ্রোহী বিবেচিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ছিলনা।

---

[৪৫] এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০; আবদুল করিম, Muhamadan Education of Bangla. (Calcutta: Metcalfe press, 1900), p. 13-14

[৪৬] মুহা: মুস্তাক আহমদ, শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ হুসায়ন আহমদ মাদানী: জীবন ও কর্ম, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ৩৭।

[৪৭] মুহাম্মদ ইদরীস হুশিয়ারপুরী, খুতবাতে মাদানী; দেওবন্দ: যমযম বুক ডিপো ১৯১৭), পৃ. ৪২০।

[৪৮] অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, "বাংলাদেশে সিপাহী বিপ্লব এবং তার ব্যর্থতার পরিণতি, আব্দুল গফুর (সম্পা), আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ১০৮; খালেদ মাসুকে রসূল, শেখ আবদুর রহীম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৪-১৫।

[৪৯] আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের অবদান" ইনকিলাব স্বারক সংখ্যা, (ঢাকা: ১৯৮৪), পৃ. ১৭-১৮।

ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হতো। দিল্লীর ঐতিহাসিক রহীমিয়া মাদরাসা যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ[৫০], শাহ আবদুল আযীয[৫১] ও শাহ আবদুল গণী[৫২] এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঐ রহীমিয়া মাদরাসা থেকে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীর মত বিপ্লবী আলিম ও সংস্কারক গড়ে উঠেন। ইংরেজরা এ

---

[৫০] হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস, দার্শনিক, মুজতাহিদ, রাজনীতিক, গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক। উপমহাদেশে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হযরত শাহ আব্দুর রহীম। ১৫ বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর (১৭৯১ খ্রী.) পর রহীমিয়া মাদরাসায় ১২ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৭৩০ সালে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওারায় গমন করে তথাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৩২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় রহীমিয়া মাদরাসায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থেকে ১৭৬২ সালে ইনতিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন। তার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলমানরা শরীয়ত ও তরীকতের পাশাপাশি জগত ও জীবন তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে যুগোপযোগী গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার চেতনা লাভ করেন। শরীয়তের যাবতীয় বিধানের অন্তনিহিত দর্শন সম্বলিত তার প্রণীত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। এ গ্রন্থে মানবতার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করা হয়েছে। 'ইলাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা' গ্রন্থে তিনি খিলাফতে রাশিদাকে ইসলামের মূলনীতির উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বব সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। (অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, মওজে কাওসার, লাহোর, ফীরোয এন্ড সন্স, ১৯৫৮, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬)।

[৫১] হযরত শাহ আব্দুল আযীয (র.) ছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি দিল্লীর রহীমিয়া মাদরাসায় ৬০ বছর শিক্ষকতা করেন। মাদরাসাটি ছিল তার পিতামহ হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর ন্যায় তিনিও কুরআনী নীতির আলোকে যথার্থ ইসলামী জীবন পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর (আংশিক) ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। 'বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন' ও 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যা' তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শিক্ষকতা, ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সে যুগের ইসলামী চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি অনেক যোগ্য শিষ্য তৈরী করেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর মতে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর শাগরিদদের দ্বারা যেখানে উপকৃত হয়েছে ১০জন লোক, সেখানে হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের শাগরিদদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে ১০ হাজার লোক। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা ও দর্শন পেশ করলেও তিনি এর সূচনা করে যেতে পারেননি। এটি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব পড়ে হযরত শাহ আবদুল আযীযের উপর।। তিনি এ উদ্দেশ্য হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সামরিক ট্রেনিং দিয়ে প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন এবং নিজে দিল্লীতে জিহাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। তৎকালে ভারত উপমহাদেশে অবস্থিত হাদীস চর্চার এমন কোন কেন্দ্র ছিল না যেখানে হযরত শাহ আবদুল আযীযের শিষ্য পাওয়া যেত না। (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ঢাকা ১৯৭২), পৃ. ১৫৫।

[৫২] মাওলানা আব্দুল গণী মুহাদ্দিস ১২৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৮১৯ খ্রী. দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানীর পুত্র খাজা মাসুমের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি সর্বপ্রথম আপন পিতা খাজা আবু সাইদ মুজাদ্দেদীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দেসীর (মৃঃ ১৮৪৬ খ্রী.) নিকট হাদীস শিক্ষা করে সনদ লাভ করেন। নকশবন্দীয়া তরিকতের পরম্পরার প্রসিদ্ধ শায়েখ হযরত মির্যা মাযহার (মৃঃ ১৯৯৫ হি.)-এর নিকট আধ্যাত্মিক বয়'আত গ্রহণ করে খিলাফত লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মদীন শরীফে হিজরত করেন এবং সেখানে হাদীসের দরস দেন। ৬ই মুহাররম ১২৯৬ হি. মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। (তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ, ১ম খন্ড), পৃ. ৯৫-৯৬।

মাদরাসাকে কামানের আঘাতে উড়িয়ে দেয়। মাদরাসার জায়গাটি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী লালা রামকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক হিন্দুর কাছে বিক্রয় করে দেয়। আকবারী মজজিদে শাহ আব্দুর কাদির একটানা চল্লিশ বছর পবিত্র কুরআনের দরস দেন। সেই মসজিদটিকেও এই অপরাধে গুড়িয়ে দেয়অ হয় যে, এখান থেকে স্বাধীণতা প্রেমিক আলিম তৈরী হয়। প্রতিশোধের নেশা গুড়িয়ে দিয়েই শেষ হয়নি। মসজিদের জায়গাটিকে মদ্যপানের একটি ক্লাবে পরিণত করা হয়।[৫৩]

শেখপুরা, গুজরানগওয়ালা ও মন্টোগোমারী জেলা থেকে বহু মুসলিম কায়েদীকে গ্রেফতার করে লাহোরে শাহী মসজিদে আনা হয়। মসজিদের ভেতরই তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। বিদ্রোহী মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূথিকে আহত করণার্থে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।[৫৪]

শাহ আবদুল আযীযের সময় ে কাজ আরও প্রসারিত ও কর্মমুখের হয়ে উঠে। তাঁরই দুই সুযোগ্য শিষ্য সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসামইলের হাতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র শক্তি উজ্জীবিত হয়ে উঠে।[৫৫]

যেহেতু আযাদীর জন্য জিহাদ করবেন সৈয়দ আহমদ, সেহেতু জিহাদের পূর্বে আল্লাহর ঘর ও মহানবী (সা.) এর মাযার যিয়ারত করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি ১২৩৬ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের দিন কতিপয় সঙ্গী নিয়ে হিজাজের পথে যাত্রা করলেন। ১২৩৭ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে সেখানে হজ্জব্রত সমাপন করে তিনি মদীনা শরীফেও সফর করেন। কাবা ঘরের ছায়াতলে বসে তিনি শপথ নিলেন জিহাদের। আল্লাহর দরবারে তিনি বিগলিত চিত্তে প্রার্থনা জানালেন জিহাদের পথে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। এর পর তিনি সদলবলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৫৬] তদানীন্তন মুসলমানদের ধমীয় ও রাজনৈতিক অধঃপতন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। সেজন্য প্রথমে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে কুসংস্কার বর্জন, চরিত্র সংশোধন ও শুদ্ধ সরল কর্মপদ্ধতি গ্রহণের আন্দোলন চালাতে লাগলেন।[৫৭]

উল্লেখ্য যে, হিজাজে অবস্থান কালে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন মনীষী ও মুজাহিদদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। বিশেষ করে তৎকালীন মুসলিম জাতির সংস্কারপন্থী দল ওহাবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।[৫৮] প্রকৃত পক্ষে তিনি ওহাবী ছিলেন না।[৫৯] বলা বাহুল্য যে, মুজাহিদ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল

---

[৫৩] আবদুর রহমান, তাহরীকে রেশমী রুমাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[৫৫] আবদুল মওদুদ, "বালাকোট বিপর্যয়ের পটভূমি", (ঢাকা: ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৮), পৃ.৪১২।

[৫৬] ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

[৫৭] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

[৫৮] ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৫৩।

[৫৯] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬।

প্রধানত মুসলিম সমাজের ঈমান-আক্বীদা কে শিরক, বিদ'আত ও বিজাতীয় অনুকরণ প্রভৃতি জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে পূর্ণ ঈমানী চেতনায় মুসলমানদের ফিরিয়ে আনা।[৬০]

সৈয়দ আহমদ শহীদের এ মহৎ আন্দোলন, সংগঠন, পরিচালন এবং প্রাণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বাংলার বীর। সন্তান মাওলানা ইমামুদ্দিনের[৬১] ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এমনি এক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন আলিমদের অবিসংবাদিত নেতা হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র.) (১৭৪৬-১৮২৩) ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব'[৬২] (শত্রু কবলিত দেশ) হিসেবে ফাতওয়া দেন এবং মুসলমানদের জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্বক জিহাদ ফরজ ঘোষণা করেন।[৬৩] বলা বাহুল্য যে, তখন থেকেই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। শাহ আবদুল আযীযের দারুল হরব সংক্রান্ত এই ফাত্ওয়া 'ফাতওয়ায়ে আযীযিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।[৬৪]

আযাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) ১৭৮৬ সালে অযোধ্যার অর্ন্তগত রায়বেরলী জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। সৈয়দ বংশের এ নবজাতকের উর্ধবতন পয়ত্রিশতম পুরুষ ছিলেন বিশ্বনবীর জামাতা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)। তাঁর পিতা সৈয়দ ইরফান ছিলেন একজন

---

৬০ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান "জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা"। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, (অধ্যাপক আবদুল গফুর (সম্পা), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৯২।

৬১ মাওলানা ইমামুদ্দীন ১৭৮৮ সালে নোয়াখালী জেলার অর্ন্তগত চৌমুহনী বাজারের নিকটস্থ হাজীপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মাওলানার প্রকৃত নাম আবুল ফরিদ মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন। পিতার নাম মুন্না ভূঁইয়া। মাওলানা ১০/১২ বছর বয়সে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি দিল্লী গমন করে মাদরাসা-ই-আযীযিয়ায় ভর্তি হয়ে শাহ আবদুল আযীযের নিকট ৫ বছর অধ্যায়ন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ শহীদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সুখ্যাতি ও তার ধর্মীয় সংস্কারাভিযান চার দিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি লখনৌতে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা ১৮২০ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন আজীবন চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের ধর্ম প্রচার করেন। তিনি বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদের সাথে যোগদান করে গাজী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তার ভাই আলীমুদ্দীন এ যুদ্ধে শহীদ হন। মাওলানা ইমুদ্দীন ১৮৫৭ সালে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ মোঃ ছালেহ উদ্দীন, "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর নোয়াখালীর অবদান", অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, কুষ্টিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ৯১-৯৫।

৬২ কতিপয় ইসলামী আইনজ্ঞের মতে পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। দারুল হর্ব ও দারুল ইসলাম। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন সেটি দারুল ইসলাম। আর যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন নয় সেটি মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হওয়া পর্যন্ত দারুল হরব হিসেবে গণ্য। এ মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রে মূলতঃ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। কোন কোন আইন বিশেষজ্ঞ এ মতের সহিত দ্বিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে শত্রুতামূলক কারণ ছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোভাব পোষণ ইসলাম পরিপন্থী। (আল কুরআন ২ ঃ ১৯০; ২২ ও ৩৯-৪০) কোন কোন মাযহাবের আলিমগণ দারুল হরব ও দারুল ইসলাম ব্যতীত তৃতীয় একটি দ্বার-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেটি হল দারুস সুলহা বা দারুল আহদ। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন নয় অথচ ইসলামের সাথে সে দেশের নানাবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান, সে দেশকে দারস সুল্হ বলা হয়। দ্রঃ Md. Mohar Ali, "The Bengal Muslinis Repudiation of the concept of British India as Darul Harb 1870." The Dacca University Studies, 1971, P.12.

৬৩ মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০।

৬৪ শাহ্ আবদুল আযী, ফাতওয়ায়ে আযীযিয়া, (দিল্লী: মাতবায়ে মুজতবায়ী, তা.বি), ১ম খন্ড, পৃ. ১৭।

খ্যাতনামা কর্মনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী ব্যক্তি।[৬৫] বেরিলীতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি লক্ষৌ গমন করেন। বাল্যকাল হতেই তার সৈনিক সুলভ কুচকাওয়াজ ও ক্রীড়া কলাপের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। লক্ষ্নৌ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য দিল্লী এসে শাহ ওয়ালীউল্লাহর পুত্র তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ আলিম শাহ আবদুল আযীয এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৬৬] খিলাফত লাভের পর মাওলানা আবদুল আযীয-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে পরিস্কার দেখতে পেলেন ইংরেজদের মধ্যে সর্বভারত-গ্রাসী ক্ষুধা। স্বদেশের এ দুঃসময়ে তিনি নিরব হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি মধ্য ভারতের স্বাধীন নবাব আমীর খানের সৈন্যদলে যোগদান করে ঝাপিয়ে পড়লেন আজাদী সংগ্রামে। এক পর্যায়ে আমীর খানের সাথে ইংরেজদের সন্ধি হয়ে গেলে সৈয়দ আহমদ সাধারণ নাগরিকের জীবন যাপন করার জন্য ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রায়বেরিলীতে চলে আসেন।[৬৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পাক-ভারতীয় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় চেতনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী। তাঁর হাতেই মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংস্কারের যে কাজ আরম্ভ হয়, সে কাজ তার সুযোগ্য পুত্র সিরাজুল হিন্দ আবদুল আযীযের সময় আরও আন্দোলিত, প্রসারিত ও কর্মমুখর হয়ে উঠে। তারই দুই সুযোগ্য শিষ্য সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের হাতে এ আন্দোলন উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। তাদের অস্ত্র প্রথমে উদ্যত হয়। ক্ষমতাধারী শিখদের উপর; কারণ শিখরাই তখন মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে বিপন্ন করে তুলেছিল।[৬৮]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুজাহিদ আন্দালনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের আকীদা আমলের সংস্কার। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করা। তৃতীয় পর্যায়ে সর্বপ্রকার বৈরী শক্তির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। চতুর্থ পর্যায়ে জান-মাল দিয়ে কেন্দ্রীয় মুজাহিদ আন্দোলনকে সহযোগিতা করা।[৬৯]

সর্বোপরি ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ন্যায় জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর উদ্দীপনা জাগ্রত করা এবং ভারতে বিশুদ্ধ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা।[৭০]

মাওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ, মৌলভী বরকতুল্লাহ এবং মাওলানা আব্দুল হাকীম এর নেতৃত্বে মুজাহিদ আন্দোলনের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। বাংলার এমন কোন জনপদ ছিল না, যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সাইয়েদ আহমেদ এর সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা

---

[৬৫] ফজলুর রহমান খান, "আযাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলবী", ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা জানু-মার্চ-১৯৬৩, পৃ. ৩৫০।

[৬৬] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ২য় সংস্করণ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৬।

[৬৭] ফজলুর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

[৬৮] আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-১৩।

[৬৯] মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[৭০] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৬।

সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন এবং ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে একদিন তারা সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না।[৭১]

মুজাহিদ আন্দোলনের উপর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুপন্ডিত 'মাওলানা' ও ধর্মনিষ্ঠ সূফী'-দের প্রভাব বরাবরই ছিল অব্যাহত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী । আর তাঁরা ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরলবী, শাহ ইসমাইল, শাহ আবদুল হাই, কুতুব-ই-ওয়াক্ত ইউসুফ ফুলাতী, নিজাম উদ্দীন চিশতী, ইমাম উদ্দীন বাঙালী, ওয়ালী মুহাম্মদ ফুলাতী, নাসির উদ্দিন মংলারী ও নাসির উদ্দিন দেহলবীর মত সর্বজনমান্য আলিম ও সূফী। শাহ আবদুল আযীযের ওয়ারিস শাহ ইসহাক মুজাহিদ বাহিনীকে বরাবরই সাহায্য করেছেন। তাঁর এই সাহায্য সহযোগিতার ধারা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হেজাজে হিজরত করার সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৭২]

মুজাহিদ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাজানো মোকাদ্দমার নথিপথ অনুযায়ী সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করার দিনটি ছিল ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর। সেদিন থেকেই সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র মুজাহিদগণ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৭৩] সাইয়েদ আহমদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলন ছিল মূলত সংস্কারধর্মী। এদেশের পর্যদুস্ত মুসমানদের ঈমান - আকীদা সংস্কার করার সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার এবং শোষিত নৈরাজ্য পীড়িত জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও তাদের অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ।[৭৪] ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে বালাকেট যুদ্ধ সংগঠিত হয়। শিখ পক্ষে বিশ হাজার সুসজ্জিত শিক্ষিত সৈন্য ছিল। অপর দিকে মুজাহিদ সংখ্যা ছিল মাত্র নয়শত।[৭৫]

বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১) ও শাহ ঈসমাইল (১৭৮২-১৮৩১) সহ অসংখ্যা মুজাহিদ আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। মুজাহিদদের আত্মত্যাগ যুগে যুগে যুগিয়েছে স্বাধীনতার চেতনা।[৭৬] উল্লেখ্য যে, বালাকোট যুদ্ধ সাইয়েদ আহমদ শহীদ শাহাদত বরণ করলেও গোটা ভারতে তিনি স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনা জাগ্রত করে যান। তাঁর ব্যাপক অভিযানের ফলে শহরে, গ্রামে, উচ্চ বিত্ত, নিম্ন বিত্ত, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষ সকলে স্বাধীনতার জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন ও দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে উঠে।

গ্রামের সাধারণ মহিলারা জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যহ গৃহে ভাত রান্না করার পূর্বে মুজাহিদ বাহিনীকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে মুষ্ঠি চাউল জমানোর প্রথা প্রবর্তন করেন। মুজাহিদ বাহিনীর জীবনধারা ছিল অত্যন্ত

---

[৭১] মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত।

[৭২] আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭ ।

[৭৩] মওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৭৫] আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮।

[৭৬] আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, (ঢাকা: আল-আমীন রির্সাস একাডেমী ১৯৯৮), পৃ. ১১৭।

পবিত্র। তাঁদের জীবনযাত্রায় ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় ঈমান, আমল, ইখলাস, ধৈর্য্য অবিচলতা ও বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ইত্যাদি সুন্দরভঅবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল।

বাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ[৭৭], (১৭৮০-১৮৬০), মুহসেনউদ্দীন (দুদুমিয়া) (১৮১৯-১৮৬২)[৭৮] মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর)[৭৯] ছিলেন সেই ধারার মুজাহিদ। সৈয়দ আহমদ বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম বিরোধী

---

৭৭ মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ১৭৮০ সালে বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুরপুরের নিকটস্থ শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল জলীল তালুকদার একজন সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ কলিকাতার বিখ্যাত আলিম মাওলানা বাশারত আলীর নিকট ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। দীর্ঘ বিশ বছর মক্কাতে তাফসীর ও হাদীস সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে। তান একজন খ্যাতি সম্পন্ন আলিম, আরবী ভাষার পন্ডিত ও সুনিপুণ তার্কিকরূপে ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারী জেমস্ টেলরের মতানুসারে, মক্কায় থাকাকালে হাজী শরীয়তুল্লাহ আরবের ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের মধ্যেই দিনযাপন করেন। মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মুসলমান সমাজে ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচার-প্রসার, ইসলামী দাওয়াহ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন ধরনের শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমান সমাজে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং পাড়ায় পাড়ায়, মসজিদে মসজিদে তিনি কুরআন ও নামায শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মুসলমানরা হিন্দু প্রভাবিত হয়ে কবর পূজা, পীরপূজা ইত্যাদি নানা ধরনের শিরকমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হাজী শরীয়তুল্লাহ এই করুণ অবস্থা দেখে এদেশের মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করেন। তার এ আন্দোলনকে শুদ্ধি আন্দোলন বললেও অত্যুক্তি হবে না। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের শিক্ষা এদেশে মুসলমানদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠাই ছিল এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। হাজী শরীয়তুল্লাহ আল্লাহ ও রাসূলুলাহ (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত নয় এমন ধরনের যে কোন স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানকে শিরক ও বিদআত বলে প্রত্যাখান করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮৪০ খ্রীঃ ৪৯ বছর বয়সে তার নিজ গ্রাম শামাইলে ইন্তেকাল করেন। তার বাড়ীর আঙ্গিনাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। দ্রঃ উৎ. গঁরহঁফফরহ অযসবফ কযধহ, ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ঃযব ঋধৎধরফর গড়াবসবহঃ রহ ইবহমধষ ১৮১৮-১৯০৬, (উযধশধ: ওংষধসরপ ঋড়ঁহফধঃরড়হ ইধহমষধফবংয, ১৯৮৪), চ.২১৯-২০; মোঃ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৪২-১৪৪।

৭৮ হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তার একমাত্র সুযোগ্য পুত্র দুদুমিয়া (মুহসীন উদ্দীন আহমেদ) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১৮১৯ সালে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় এত বড় আলিম না হলেও তিনি একই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। পাঁচ বছর মক্কা শরীফে শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি দেশে ফিরে পিতার নিকট অধিকতর ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেন। ফারায়েযী আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা ছিল অদ্বিতীয়। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তার পিতাকেও ছাড়িয়া যান তাঁকে এ আন্দোলনের যৌথ প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে। ফারায়েযী ভ্রাতৃত্বকে তিনি একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সমাজে রূপান্তিরিত করেন। আজ থেকে দেড়শ বছর আগেই দুদুমিয়া ঘোষণা করেন যে, ভূমির মালিক আল্লাহ; তাই সরকার ছাড়া জমিদার বা তালুকদারের খাজনা আদায়ের অধিকার নেই। তিনি তার অনুসারীদের এলাকায় ব্রিটিশ কোর্টের পাশাপাশি নিজস্ব কোর্ট স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮৫৯ সালে মুক্তি লাভ করেন। বিপ্লবী নেতা দুদু মিয়া জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ১৮৬২ সালে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ ডক্টর মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৫-৩৬; Muhammad Abdul Latif, "The Role of the Ulama in Bengal Politics (1906-1947 A.D.)". Unpublished Ph.D. Thesis, University of Dhaka, 1997, P.37.

৭৯ মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর) ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার চাঁদপুর গ্রামের পশ্চিমাংশে হায়দারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ হাসান আলী এবং মা রোকেয়া আবেদা খাতুন। তিতুমীরের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর। তারা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আরবদেশ হতে বহু দেশে গমন করেছিলেন। তিতুমীরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় স্থানীয় মক্তবে। তিনি হাফিযে কুরআন ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদীস, মাসআলা-মাসাঈল, ফারায়েয, কাব্য ও দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮২২ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর আরব

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় ইসলাম ধর্মানুযায়ী সংস্কার আন্দোলন সফল হতে পারে। সংস্কারের কর্মসূচী কেবল যে সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে কার্যকরী করতে হবে, তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষ বাইরে থেকেও চাপিয়ে দিতে হবে। আরবের ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব, বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত জামালউদ্দীন আফগানী, হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র দুদু মিয়া এরা সকলেই এই ধারণা পোষন করতেন।[৮০]

অনেক ইউরোপীয় লেখকদের মতে সৈয়দ আহমদ শহীদের সংস্কার আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলা সংগত হবে না। সৈয়দ আহমদ শহীদ যখন আরবে ছিলেন, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ওহাবী আন্দোলন তখন স্তিমিত। মুজাহিদ আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য দুটি গ্রন্থ 'সিরাতুল মুস্তাকিম' ও 'তাজকিরাতুল ইমাম' তাঁর হজযাত্রায় পূর্বেই সংকলিত হয়। তকলিন সম্পর্কে সৈয়দ আহমদের মধ্যম পন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ও সূফীবাদের প্রতি তাঁর এ মনোভাবই ওহাবী আন্দোলন ও মুজাহিদ আন্দোলন পৃথক করেছে।[৮১]

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামী দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ মনে করে যে, আপাদত জিহাদের পরিবেশ নেই, তাই তাঁরা বাংলাদেশে এবং অন্যত্র ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এদের নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রধানত মাওলানা ভ্রাতৃদ্বয় মৌলভী বিলায়েত আলী (মৃত ১৮৫২) এবং মৌলভী ইনায়েত আলী (মৃত ১৮৫৮)। মুজাহিদ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন পর্যাক্রমে চট্রগ্রামের সূফী নুর মুহাম্মদ, মাওলানা আবদুল হাকীম, মৌলভী আলিমুদ্দীন, নোয়াখালীল মাওলানা ইমামুদ্দীন, মাওলানা লুৎফুল্লাহ শহীদ ও আলাউদ্দিন বাঙ্গালী। সিলেটের আশরাফ আলী মজুমদার, কুমিল্লার মাওলানা আশেকুল্লাহ, রাজশাহীর মাওলানা মুহাম্মদ মনিরুদ্দীন, বরিশালের মাওলানা আমিনুদ্দীন, ময়মনসিংহের শায়খ হাসান আলী, মুন্সী ইবরাহিম শহীদ, কুষ্টিয়ার কাজী মিয়াজান, ঢাকার সায়্যিদ

জাহানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করে ১৮২৭ সালে তিতুমীর দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে সফল করে তুলতে তিনি কর্ম ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়েন। তার ডাকে চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় যথেষ্ট সাড়া জাগে এবং তাওহীদী চেতনায় নবযাত্রা আরম্ভ হয়। ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রমের সম্প্রসারণে বিভিন্ন জায়গায় অনাবাদি মসজিদসমূহ মেরামত করে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। সভা সমাবেশ ও ধর্মীয় জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। জমিদাররা কৃষকদের ঘোষণা করে দেয় যে, তিতুমীরের অনুসারীদের দাড়ি রাখার জন্য বাৎসরিক আড়াই টাকা দাড়ি কর দিতে হবে। কাচা মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঁচশত টাকা এবং পাকা মসজিদের জন্য এক হাজার টাকা দিতে হবে। প্যাচা, পাচু, হরি ও কড়ি ইত্যাদি প্রচলিত নাম পরিবর্তন করে কেউ মুসলমান নাম রাখলে পঞ্চাশ টাকা কর দিতে হবে। শুধু ঘোষণা করেই কৃষ্ণদেব থেমে থাকেনি বরং জোর করে ঐবার আদায় করতে থাকে। দাড়ির কর দিতে অস্বীকার করায় তিতুমীরের অনুসারী আমিনুল হক অসহ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তিতুতীর ছিলেন একজন সাচ্চা ঈমানদার। ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর সুপরিকল্পিতভাবে মেজর স্কট ও আলেকজান্ডারের বাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় হামলা করে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর প্রচন্ড গোলাবর্ষণে তিতুমীর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অন্য কোন পথ না দেখে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। তিতুমীর ও তার ৫০ জন অনুসারী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। প্রায় ৩০ জন আহত হন এবং ২৫০ জন বন্দী হন। দ্রঃ গঁরহঁফফরহ অযসধফ কযধহ, ঞরঃঁসরৎ ধহফ যরং ঋড়ষষড়বিৎং, (রহ ইৎরঃরংয ওহফরধহ জবপড়ৎফং ১৮৩১-১৮৩৩ অ.উ.), (উধপপধঃ ওংষধসরপ ঋড়ঁহফধঃরড়হ, ১৯৮০), চ. ৫৬; আবদুল কাদির সালেহ, "মুসলিম জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে। তিতুমীরের অবদান", দৈনিক আল মুজাদ্দেদ, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪০২।

[৮০] সৈয়দ মুর্তজা আলী বাংলায় মুসালম ধর্মীয় আন্দালন, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ৮৪।

[৮১] সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪।

মুজাফফর শহীদ, মৌলভী করিম বখশ শহীদ, হাজী বদরুদ্দিন (বংশাল) ও মাওলানা আজিমুদ্দিন।[৮২] সৈয়ধ আহমদ শহীদের এসব অনুসারীদের কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ওয়াজ নসীহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এদেশের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা সংস্কার করায় সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার এবং শোষিত নৈরাজ্য পীড়িত জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও তাদের অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে বালাকোট পরবর্তী সশস্ত্র সংগ্রাম সিপাহী বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নে যতগুলো গন-আন্দোলন করা যায়।[৮৩]

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের পর শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষাপট হল ওহাবী আন্দোলন (১৮৩১ ১১১ ১১৯), ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও দেওবন্দ আন্দোলন।

ওহাবী আন্দোলন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী সম্প্রদায়ের নাম।[৮৪] তিনি ১৭০৩ সালে নজদের অন্তর্গত উয়ায়না নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল ওহাব একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ স্বীয় পিতার কাছে কুরআন-হাদীস ও ফিকহের শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি তাঁর নেতৃত্বে আরবে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। কেননা তৎকালে আরব অঞ্চল শিরক, বিদআত, অবৈধ রসম-রেওয়াজ, কবর পূজা ইত্যাদি নানাবিধ কুসংস্কারে নিপতিত ছিল। শায়খ মুহাম্মদ এ সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং নিজের এলাকায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রতি মানুষকে আহবান করতে থাকেন। কিন্তু তার এ আহবান নিজের ভূখন্ডে জনসমর্থিত হয়নি বিধায় তিনি বাধ্য হয়ে দারিয়া নামক স্থানে হিজরত করেন। দারিয়া অঞ্চলের বিশিষ্ট উদীয়মান প্রভাবশালী নেতা মুহাম্মদ ইবনে সউদ তাঁর সংস্কার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে তা একটি গতিশীল আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[৮৫] উপরিউক্ত ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ আরম্ভ হয়। উনিশ শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৮৬] পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ভারতের বিভিন্নস্থানে ইংরেজ বিরোধী যে প্রতিরোধ দেখা দেয়, সাধারণত তা ছিল কোন রাজা বা জমিদারকে কেন্দ্র করে । উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরেজদের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ, ঈঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ বহুলাংশে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ রাজা বা জমিদারদের স্বার্থে বা নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু ওহাবী আন্দোলন ছিল এর ব্যতিক্রম। কোন রাজা বা রাজ পুরুষের স্বার্থে বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। বিধর্মী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে এ আন্দোলনের জন্ম। এ

---

[৮২] দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস, অগ্রপথিক সংকলন। (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), ২য় খন্ড, পৃ.৭০।

[৮৩] মাওলানা মুহিউদ্দিনন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

[৮৪] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

[৮৫] মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ (ঢাকা: শান্তি ধারা প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ২৬৫।

[৮৬] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রখ্যাত আলিম সমাজ।[৮৭]

কাঙ্খিত সফলতা লাভে ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তোলে। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের এক অংশ ক্রমশ ওহাবী অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ও ভারতের অন্যান্য সংগ্রামীদেরকে এই সচেতনতা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণাই পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সশস্ত্র আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়, যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পর্যবষিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। কারো কারো মতে, ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওহাবীদেরই।[৮৮] ভারতে পরিচালিত এই আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ফিরে যাওয়াই লক্ষ্য বিধায় এ আন্দোলনের নাম 'তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলন। আঠারো শতকে হেজাজে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের সংস্কারমুলক কার্যাবলীকে ইংরেজরা ভারত বর্ষের মুসলমানদের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং এদেরকে ইসলাম ধ্বংসকারী ওহাবী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে, যাতে ভারতের মুসলমানদের মনে আরবের ওহাবীদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়।

তাই ভারতের 'তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলনকে এদেশের মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য 'তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলনের নেতা ও অনুসারীদের ইংরেজরা ওহাবী হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারতে সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী শাহ ওয়ালীউল্লাহ যখন কয়েক বছর মক্কায় বিদ্যা শিক্ষার্থে অবস্থান করছিলেন, তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবও সে সময় মক্কায় পড়াশুনা করছিলেন।

তাঁদের সাক্ষাত বা যোগাযোগের কোন নজির পাওয়া যায় না, তবে মক্কার বিদ্যোৎসাহী সমাজের যে চিন্তাধারা ওহাবী নেতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহর ঘনিষ্ট পরিচয় হয়েছিল। তাঁর রচনাবলীতে সে আভাস পাওয়া যায়।[৮৯] অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ বলেন, নেহায়েত সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে ওহাবী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হান্টারও তাঁর গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রতিরোধ-আন্দোলনকে ওহাবী আখ্যা দেন।[৯০]

প্রকৃত পক্ষে আঠারো শতকের শেষ ভাগে মহামদ ইবনে আবদুল ওহাব যে নীতিনিষ্ট আন্দোলনের সুত্রপাত করেন তার সাথে ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে।[৯১] ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওহাবী বলে পরিচয় দেয়নি। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার অনুসারীরা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করেন না বরং তারা তাদেরকে সুন্নী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নতের

---

[৮৭] শান্তিময় রায়, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান, (কালকাতা :মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৪), পৃ, ১০।

[৮৮] আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, (ঢাকা: তা.বি), পৃ. ১১৮।

[৮৯] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ানস মুসলমান, আব্দুল মওদুদ অনুদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

[৯১] মুহাম্মদ ইনাম উল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত করতে আগ্রহী।[৯২] পীর ফকির ও আস্তানা পূজার বিরুদ্ধাচরণ করা আরবের ওহ-াবীদের প্রধান নীতি।

১৮০২ সালে এই ওহাবীরা মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কবর পর্যন্ত ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় ওহাবী নেতারা অনেকেই পীর এবং কবর-আস্তানার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোকে ঘোর পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেননি। অকৃত্রিম ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আরব ও ভারতের ওহাবী আন্দোলন আপোষহীন ও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আধুনিক মুসলমান সমাজে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনের সূচনা হয় ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, ভারতের কৃষক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয় ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।[৯৩]

ওহাবীদের আন্দোলন ভারতের আদিতম এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন লড়াইগুলোর মধ্যে অন্যতম। গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারতীয় ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরেধৌ লড়াই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন ঐতিহাসিক রচনাতেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী এই মহান সংগ্রামকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি । ওহাবী কথাটি একটি ভুল প্রয়োগ। অনেক মুসলমান এদের অমুসলমান বলে গণ্য করেন। আসলে ব্রিটিশরাই তাদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করতে ওহাবীদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু অচিরেই ওহাবীরা ঘোরতর ব্রিটিশ বিরোধী ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ সংগ্রামশীল দল হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তারা ব্রিটিশের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করে দার-উল-হারব এর বদলে ভারতকে দার-উল-ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃক সরকারী নথিপত্রে এদেরকে আবার কখনও কখনও হিন্দুস্থানের বর্মোন্মাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় ওহাবীদের প্রকৃত নাম ছিল 'তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া'। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সায়্যিদ আহমদ বেরলবী।[৯৪] ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৮৫৬ সালের প্রথম ভাগে লর্ড ডালহৌসী ভারত ছেড়ে চলে যান এবং তদস্থলে কাউন্ট ক্যানিং উপমহাদেশের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন। তার সময়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা একটি উল্লেখযোগ্য ঘঠনা। যাকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো দেশব্যাপী জনগণের প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন; যার সূচনা হয়েছিল শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর যুগ থেকেই। এই স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর ফলশ্রুতি এবং এই আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান সবাই সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র দেশকে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের অধীনে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।[৯৫]

সরকারী বিবরণে এটিকে একটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলা হলেও বস্তুত এটি ছিল স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর সম্মিলিত সংগ্রাম। ব্যারাকপুরের সেনানিবাস থেকে বিদ্রোহ সূচিত হয়। তারপর খুব অল্প সময়ের

---

[৯২] শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫।
[৯৩] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
[৯৪] শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
[৯৫] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

মধ্যে গোটা ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং হিন্দু, মুসলিম, সৈনিক, জমিদার, রাজন্যবর্গ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি ও পন্ডিতদের সকলে বিদ্রোহীদের দলে সমবেত হন। প্রায় এক বছর পর্যন্ত এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ডিজরেলী ভারতীয়দের এ সংগ্রামকে মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেন। ড. হজুমদার সহ অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি এটিকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করেন।[৯৬]

উল্লেখ্য যে, বালাকোটের যুদ্ধের পর এ আন্দোলনের কর্মীবাহিনী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে। এ কেন্দ্রটিই ছিল মূল ঘাঁটি।[৯৭] এ কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন। শাহ্ ইসহাক দেহলবী। ইংরেজ গোয়েন্দাদের সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ১৮৪৪ সালে মক্কায় হিজরত করেন।[৯৮]

পরবর্তীতে নেতৃত্ব দেন মাওলানা মামলুক আলী, মাওলানা কুতুব উদ্দীন দেহলবী, মাওলানা মুজাফ্ফর হুসাইন কান্দুলী ও মাওলানা শাহ আব্দুল গণি মুজাদ্দিদী। এ আন্দোলনের সার্বিক কাজকর্মে দিল্লী কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ঠ উলামা মাশায়িখ, ছাত্র ও মুরীদ ছাড়াও বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন মাওলানা আহমদ উল্লাহ মাদ্রাজী, মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মৌলভী ইমাম বখশ, মুফতী সদদ্দীন, কাজী ফয়েজ উল্লাহ দেহলবী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ বাদানী, সাইয়েদ মুবারক শাহ রামপুরী, মুফতী এনায়েত আহমত কাকুরী, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী প্রমূখ।[৯৯] এ সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট নিম্ন পর্যায়ে ছিল। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিয়োগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ থাকে। এ অবস্থা সম্পর্কে মিঃ হান্টার সরকারী দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করে একটি বিবরণী দেন। নিম্নে বিবরণটি উল্লেখ করা হলোঃ

বিভাগ		ইংরেজ		হিন্দু	মুসলমান	মোট
নন-রেগুলেটেড জেলা সমূহে বিচার বিভাগের কর্মচারী	৪৭		---	----		৪৭
এক্সট্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার	২৬		০৭	০০		৩৩
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর -	৫৩		১১৩	৩০		১৯৬
ইনকাম ট্যাক্স এসেসর -	৬০	১১		৪৩		০৬
রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট -	৬০	৩৩		২৫		০২
আদালতের জজ ও সাব জজ-	১৪		২৫	০৮		৪৭
মুন্সেফ -		০১		১০৮		৩৭
	১৪৬					

[৯৬] ড. অতুলচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।
[৯৭] অবুলি ফাতাহ্ মু. ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
[৯৮] ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
[৯৯] হুসাইন আহমেদ মাদানী, নকশে হায়াত, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০।

পুলিশ বিভাগের সর্বশ্রেণীর গেজেটেড অফিসার-	১০৬	০৩	০০	১০৯
ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ-	১৫৪	১৯	০০	১৭৩
ইঞ্জিনিয়ার নিম্ন বিভাগ-	৭২	১২৫	০৪	২০১
একাউন্ট বিভাগ-	২২	৫৪	০০	৭৬
ডাক্তার	৮৯	৬৫	০৪	১৫৮
শিক্ষা বিভাগ-	৩৮	১৪	০১	৫৩
কাস্টম, মেরিন, সার্ভে আবগারী প্রভৃতি বিভাগ	৪১২	১০	০০	৪২২[১০০]

এমনি এক প্রেক্ষাপটে আলিমগণের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে উত্তর ও মধ্য ভারতে ইংরেজ বিরোধী চেতনা ও আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। এ ভাবেই এ সকল উলামার প্রচেষ্টায় সারা দেশের আনাচে কানাচে কোম্পানীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হয়।

সেনাবাহিনীতেও এ চেতনা ছড়িয়ে দেয়া হয়। ব্রিটিশ সৈনিকদের যে হারে বেতন দেয়া হত সে তুলনায় জাতীয় সৈনিকদের বেতনের হার ছিল খুবই কম। পক্ষান্তরে যেখানেই যুদ্ধ শুরু হত সেখানেই রণাঙ্গনের অগ্রে প্রেরণ করা হত ভারতীয়দেরকে ফলে হতাহত যারা হতো তাদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। এদেশের উপর ইংরেজদের ধর্মীয় আগ্রাসন, রাজনৈতিক নির্যাতন ও সামাজিক নিপীড়নের নির্মম ও সেচ্ছাচারী কর্মকান্ড সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।[১০১] স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতে, হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করা, জমিদার নিলাম করা, স্ট্যাম্প প্রথার প্রবর্তন করা ইত্যাদি পাঁচটি মৌলিক কারণে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।[১০২] বিপ্লবী আলিমগণ গোপনে আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করার পর দেশব্যাপী সকল মহল থেকে একযোগে মহাবিদ্রোহ তথা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালের ৩১মে তারিখ নির্ধারণ করে অবশিষ্ট কাজ চূড়ান্ত করতে থাকেন।[১০৩] ফলে দেশের সচেতন মহলের সর্বস্তরে বিদ্রোহের ক্ষেত্র ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। ইত্যবসরে কলকাতার ব্যারাকপুরে ২৯ মার্চ মঙ্গলপান্ড নামক জনৈক সিপাহীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে হঠাৎ বিদ্রোহ শুরু হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী বলেন, নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'মাস পূর্বে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপান্ডের হাতে এ আগুন জ্বলে ওঠে। অথচ অন্যান্য স্থানে তখনও পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির কাজই চূড়ান্ত হয়নি। যার ফলে, দিল্লীতে যথা নিয়মে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বাংলার বিপ্লব প্রায় শেষ হয়ে যায়। এদিকে পাঞ্জাবে বিপ্লব এমন সময়ে শুরু হয় যখন ইংরেজ সরকার দিল্লী ও কানপুর পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দরাবাদ তথা দক্ষিণ ভারতে তখন পর্যন্ত কোন কাজই চূড়ান্ত হয়নি। মোট কথা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যুদ্ধ শুরু হওয়া ছিল ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

---

[১০০] ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ.১০।

[১০১] আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪।

[১০২] স্যার সৈয়দ আহমদ খান, ভারতে বিদ্রোহের কারণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

[১০৩] সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, উলামায়ে হিন্দ কাশান্দার মাযী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৭৮-৭৯।

১৮৫৭ সালের যুদ্ধে বিপ্লবী আলিমগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মুসলমানরা ঢাল তলোয়ার তীর-ধনুক নিয়েও বিদ্রোহে যোগ দেয়। আমীরদের মধ্যে নওয়াব আযীমুল্লাহ খান, নওয়াব আবদুর রহমান খান, নওয়াব মুজাফফরদৌলা, নওয়াব আমীর খান, নওয়াব আকবর খান, নওয়াব আহমদ কুলী খান, কানপুরের নানা সাহেব, জগদীশপুরের তাতিয়াতোপী, বিহারের কুনওয়ার সিং, রাজা নাহির সিং, রাজা অজিৎ সিং প্রমূখ অংশ গ্রহণ করেন।[১০৪] এ বিপ্লব একমাত্র স্বাধীনতার চেতনা নিয়েই সংগঠিত হয়েছিল।

তাতে সাম্প্রদায়িক কোন সংকীর্ণতা ছিল না বলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ দিল্লীর দিকে ছুটে আসে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ জমাট বাহাদুর শাহ যাফরকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিপ্লব শুরু হয়ে গেলে মুজাহিদদের জন্য সাময়িক জটিলতা সৃষ্টি হলেও শীঘ্রই সকলে নেমে পড়েন মহান মুক্তিযুদ্ধে।[১০৫]

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নেতৃত্বে থানাভবনে মুজাহিদদের 'বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার' গঠিত হয়। ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে আমিরুল মুমিনীন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবীকে 'সিপাহসলার' ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে 'কাযীউল কুত' মনোনীত করা হয়। অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের এই বাহিনী থানাভবন ও শামেলী প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধগুলোতে হযরত নানুতবী ও হযরত গাঙ্গুহী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১০৬] এদিকে লক্ষ্ণৌতে মাওলানা আহমদ উল্লাহর নেতৃত্বে মুজাহিদদের শক্তিশালী ঘাটি গড়ে ওঠে। জেনারেল বখত খান মৌলভী ফয়েজ আহমদসহ বহু সিপাহী দিল্লীতে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা করেন। নানা সাহেব পেশওয়ারের মৌলভী আযিমুল্লাহ, শাহযাদা ফিরোজ শাহ প্রমূখ মাওলানা আহমদ উল্লাহর সাথে যোগ দিয়ে লক্ষ্ণৌতে বিপ্লবী স্বাধীন সরকারের ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহান পুরের চূড়ান্ত যুদ্ধে এ বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ১৮৫৮ সালের ১৫ জুন জনৈক শিখ রাজার মিথ্যা তথ্যের কারণে মাওলানা আহমদ উল্লাহ শাহাদত বরণ করেন।

মহাবিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরেজ পক্ষ চরমভাবে পরাজিত ছিল। কিন্তু শেষ দিকে ইউরোপীয় সেনাপতিদের কর্মদক্ষতা, শক্তিশালী সমরাস্ত্র, সরকারের সাথে শিখ ও নেপালী সৈন্যদের সহায়তা এবং দেশী একটি রাজন্যবর্গের সহযোগিতার দরুন স্বাধীনতা কর্মীদের পরাজয় ঘটে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, রোহিলাখন্ড ও মধ্য ভারত ইংরেজদের পুনঃ দখলে চলে যায়। ৮ জুলাই ১৮৫৮ পর্যন্ত বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল।[১০৭] মহাবিদ্রোহের জের ধরে জন্ম নেয় দেওবন্দ আন্দোলন। দেওবন্দ আন্দোলনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঐ স্থানে একটি স্কুল ছিল। স্কুল সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে- Deoband School Arabic DAR UL-ULUM House of learning" The leading Muslim theological center (Madrasah) of India. It was founded in 1866 by Mu-

[১০৪] হুসাইন আহমদ মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
[১০৫] ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
[১০৬] আঃ রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান, (লাহোর: মাক্তবায়ে রশীদিয়া, তা.'ব), পৃ. ৯৪-৯৫।
[১০৭] সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

hammad Abid Huseyn in the Saharanpur district of Uttar Pradesh. The theologicalsition of Deoband has always been heavily influenced by the 18th century Muslim reformed Shah Wali Ullah and the early 19th century. Indian wahhabiyah giving it a very puritanical and orthodox out looks.

The program of studies is highly traditional, stressing Jurisprudence (Fiqh), Quranic exegisis (Tafsir) the study of traditions (Hadith) Scholastic theology (Kalam), and philosophy (Falsafah) modern disciplines, which are not relevent to a proper knowledge of Islam and can lead to sinful innovation (Bidah). Are ignored, and the modern practice of Islam is studied only in order to purity it of unorthodox accretions. The student is thus prepared mainly for religious leadership of the Muslim community Deobands enrollment of about 1.500 studentns is called from all parts of the Muslim world. In madrasha's library has 67,000 printed books and memuscripts in Arabic, Persian, and Urdu, A Mosque, lecture halls and student residences further serve the scholarly community.[১০৮]

উত্তর ভারতের হিমালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত সাহারানপুর জেলার একটি ছোট্ট মফঃস্বল শহর দেওবন্দ। স্থানীয় প্রবাদে বলা হয়, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রাবনের পর এ জনপদটি গড়ে ওঠে। এটি যে উপমহাদেশের একটি প্রাচীনতম জনপদ তাতে সন্দেহ নেই।[১০৯] বলা হয়ে থাকে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আমলে তার কয়েকজন মুবাল্লিগ ও দূত এই এলাকার লোকদের ফরিয়াদ শুনে এখানে আসেন। সেখানে তখন 'দেও' তথা জিনদের উৎপাত খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রেরিত মুবাল্লিগ ও দূতেরা জিনদের বন্দী করে ফেলেন। পরবর্তীকালে এখানকার একটি পুরানো কূয়া খনন করতে গিয়ে তার মধ্যে একটি জিনের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বর্ণনাটি এখানে বহুল প্রচলিত। এ জন্য এলাকার নাম হয়ে যায় দেওবন্দ।[১১০] এ ছাড়াও হিন্দুস্থানের অন্যান্য এলাকার ন্যায় এ এলাকাতেও দেবদেবীর পূজার আধিক্য ছিল। যার ফলে এলাকার নাম দেওবন্দ হয়ে যায় বলে কথিত আছে।[১১১]

দেওবন্দের নামকরণ প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দীন আনছারী বলেন, Historical records show that this town exited more than two thousand years ago and from that time it has been one of the religious centers of the Hindus. This religious center is popularly known as Devilkind

---

[১০৮] Copyright (c) 1994-2001 Encyclopcadia Britannica Inc.

[১০৯] গবেষক গত ০১/০৬/২০০১ ইং দারুল উলম দেওবন্দ সফর করেন। সেখানকার ছদরুল মুহতামিম ও নায়েবে মুহতামিমের সাথে সাক্ষাত করে আলাপ আলোচনা ও সরেজমীনে দারস্ উলুম দেওবন্দের সার্বিক অবয়ব প্রত্যক্ষ করে প্রাচীন জনপদ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন।

[১১০] ইতিহাস-ঐতিহ্য 'দেওবন্দে দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন, মাসিক পৃথিবী, ঢাকা-এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ. ৭।

[১১১] ড. হাফেজ ক্বারী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল্লাহ আজহারী, জামিয়াতুত দেওবন্দ' Journal of theological studies, Faculty of Theology, (Aligarh Aligarh Niuslim University, 1981-1982), P. 246.

and a fair is held every year in the name of Goddess. In former times a small hamlet situated at Devilkind was called Deoban. Which was later changed into Deoband[১১২]

উল্লেখ্য যে, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেওবন্দে মাওলানা মাহতাব আলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার জন্য এ এলাকার ছাত্ররা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগমন করত। মাওলানা যুলফিকার আলী স্বীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[১১৩] সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে যুক্ত প্রদেশের একটি ছোট্ট শহরে কয়েকজন আলিম কোম্পানী-শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করেন এবং কিছুকালের জন্যে ঐ শহর থেকে ইংরেজদেরকে বহিস্কার করতে সমর্থ হন।[১১৪] এঁদের নেতা ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ও সেনাপতির ভূমিকায় ছিলেন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (১৮২৮-১৯০৫)। বিদ্রোহের বিপর্যয়ের পরে হাজী ইমদাদুল্লাহ মক্কায় চলে যান স্থায়ী ভাবে। দেওবন্দের ঐ আরবী মক্তবকে ১৮৬৬ সালে দারুল উলুমে উন্নীত করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী (র.) ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।[১১৫]

দেওবন্দ ছিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী (র.)-এর শ্বশুরালয়। সেখানে বেড়াতে গেলে তিনি নিকটস্থ ছাত্তা মসজিদেই নামাজ আদায় করতেন। হাজী আবিদ হোসাইন (র.) ছিলেন ছাত্তা মসজিদের ইমাম। মাওলানা যুলফিকার আলী ও মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন ঐ এলাকার বাসিন্দা।[১১৬]

একদিন ছাত্তা মসজিদের ইমাম হাজী আবিদ হুসাইন ফজরের নামাজান্তে ইশরাকের নামাজের অপেক্ষায়। মসজিদে ছিলেন। হঠাৎ তিনি ধ্যান মগ্নতা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাঁধের রুমালের চারকোণ একত্রিত করে একটি থলি বানালেন এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিন টাকা রাখলেন। অতঃপর তা নিয়ে তিনি রওনা হলেন মাওলানা মাহতাব আলীর কাছে। মাওলানা মাহতাব আলী ৬ টাকা দিলেন এবং দোয়া করলেন। মাওলানা ফজলুর রহমান ১২ টাকা এবং হাজী ফজলুল হক ৬ টাকা দিলেন। সেখান থেকে উঠে গেলেন। মাওলানা জুলফিকার আলীর নিকট তিনি দিলেন ১২ টাকা। সেখান থেকে উঠে মাওলানা আবিদ হুসাইন। 'আবুল বারা-কাত মহল্লার দিকে রওনা হলেন। এভাবে ২০০ টাকা জমা হয়ে গেল। শেষে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা ৩০০ টাকায় উন্নীত হলো। এভাবেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি লোকমুখে বলাবলি হতে শুরু করল। জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মাওলানা হাজী আবিদ হুসাইন ভারতের মীরাঠে কর্মরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী এর নিকট এই মর্মে পত্র লেখেন যে, আমরা মাদরাসার কাজ শুরু করে দিয়েছি; আপনি অনতিবিলম্বে চলে আসুন। পত্র পেয়ে মাওলানা নানুতবী মাওলানা মুল্লা মাহমুদকে মাসিক ১৫ রূপী সম্মানী নির্ধারণ করে শিক্ষক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার মাধ্যমে মাদরাসার কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা পত্রে উল্লেখ করেন। এভাবেই

---

[১১২] Shabuddin Ansari, "Darul Uloom Deoband", Islamic Quarterly Journal, Vol. 24, (London 1980), P. 111.

[১১৩] সাইয়্যেদ মানায়িব আহসান গিলানী, সাওয়ানিয়াহ কাসিমী, (দেওবন্দ: দারুল উলুম, ১৩৭৩ হিঃ, ১ম খন্ড), পৃ. ১৮৭।

[১১৪] আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), (ঢাকা: প্যাপিরাস লাইব্রেরী, ২০০১), পৃ.৭০।

[১১৫] Ziya-ul-Hasan Faruqi, The Deoband school and the Demaned for Pakistan (London: Asia Publishing House, 1963), P. 20-27.

[১১৬] শাহাবুদ্দীন আনছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

গণচাদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাধারাকে সচল ও সজিব রাখার যে নুতন পদ্ধতির সূচনা হয় তা জাতির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করে।[১১৭]

আকাবিরে সিত্তা বা প্রতিষ্ঠাতা ছয় মনীষী কোনরূপ সরকারী অনুদান ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদুনকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের অভিনব ধারা সূচনা করেন।

আকারিবের সিত্তা বা দারুল উলুম দেওবন্দ-এর প্রতিষ্ঠাতা ছয় মনীষী বৃন্দ হলেন-

১) মাওলানা যুলফিকার আলী (১৮১৯-১৯০৪ খ্রীঃ)।
২) মাওলানা ফজলুর রহমান (১৮২৯-১৯০৭ খ্রীঃ)।
৩) মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী (১৮৩২-১৮৮০ খ্রীঃ)
৪) মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (১৮৩৩-১৮৮৪ খ্রীঃ)।
৫) হাজী মুহাম্মদ আবিদ হোসাইন (১৮৩৪-১৯১২ খ্রীঃ)।
৬) মাওলানা রফী উদ্দীন (১৮৩৬-১৮৯০ খ্রীঃ)[১১৮]

মহান প্রতিষ্ঠাতারা বুঝেছিলেন যে, আদর্শ সচেতন একদল কর্মী তৈরী করে তাদের মাধ্যমে আন্দোলনের স্রোতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হবে নিঃসন্দেহে। তাই চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মাঝেও কোন রূপ সরকারী সহযোগিতা ছাড়াই সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং মুসলিম জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দানের উপর ভিত্তি করে তারা নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুললেন এ প্রতিষ্ঠানটিকে। সেদিন থেকে শুরু হল আযাদী আন্দোলনের আরেক নয়া অধ্যায়। পাঠদানের পাশাপাশি আজাদীর দীক্ষাও চলতে থাকল। একটি সার্বজনীন ঐক্যের প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে তৈরী করা হল এর তালীম ও তরবিয়তের কাঠামো। ফলে অল্প দিনেই এর সুনাম, সুখ্যাতি ও প্রচার-প্রসার ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। অল্প দিনেই তৈরী হয়ে গেল এক নতুন জিহাদী কাফেলা। সুসংগঠিত হয়ে আবার তারা ঝাপিয়ে পড়লেন নয়া জেহাদে। দীর্ঘ সংগ্রাম ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে এ দেশের মজলুম মানুষ ফিরে পেল তাদের বহুদিনের কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ফলে ইসলামী শিক্ষার ময়দানে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। যার ফলশ্রুতিতে আজ গড়ে উঠেছে এ উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইসলামী বিশ্বে প্রাথমিক ভাবে উম্মুল মাদরাসা-ই-জামিয়া-ই-ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১১৯]

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

দারুল উলুম দেওবন্দ হঠাৎ করে স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠান নয়। বহুদিন থেকে উপমহাদেশে চলমান একটি সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনের এটি হল পরিবর্তীত অনিবার্যরূপ মাত্র। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম। মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী ও হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) মুসলিম সমাজের আমূল সংস্কার ও

[১১৭] আবুল ফাতাহ মুহা: ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
[১১৮] সায়্যিদ মাহবুব রিবী, তারীখ-ই-দার-উলুম দেওবন্দ, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।
[১১৯] শাহাবুদ্দীন আনছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

পুর্ণগঠনের মহান লক্ষ্যে যে বিশাল তৎপরতা শুরু করেছিলেন কালক্রমে সেটিকে একটি স্থায়ী ভিত্তিরূপে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দিলো দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আর এজন্যই দীর্ঘকালীন আন্দোলনের সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হযরত মাওলানা ইয়াকব নানুতবী (র) দারুল উলুম দেওবন্দ স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেনঃ "মুসলিম সমাজের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন ও উলমে দ্বীনকে পুনর্জীবিত করাই হল দারুল উলুম দেওবন্দ স্থাপনের উদ্দেশ্য।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অপরাপর কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

১) পবিত্র কুরআন মাজীদ, ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, আকাইদ ও কালাম এবং এ সকল ইলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ শাস্ত্রসমূহ তথা উলুমে আলিয়ার শিক্ষা প্রদান করে মুসলিম সমাজে ইসলামের বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সরবরাহ করা এবং রূশদ হিদায়াত ও তাবলীগে দীনের মাধ্যমে ইসলামের সার্বিক খিদমত করা;

২) ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম, আমল ও আখলাকের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং শিক্ষার্থীদের জীবন যাত্রায় সচেতন ধর্মীয় অনুভূতির উন্মেষ ঘটানো;

৩) ইসলামের প্রচার ও প্রসার, দ্বীনের যত্ন ও সংরক্ষণ, ওয়াজ ও নসীহত, রচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের বৃহত্তর প্রচারের ব্যবস্থা করা। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যাপক প্রচার করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে খায়রূল কুরূনের সাদৃশ বানানো এবং সলফে সালেহীনের যুগের ন্যায় মুসলিম সমাজে আমলী ও আখলাকী জযবা ও উদ্দীপনা জাগ্রত করা;

৪) সরকারী অনুগ্রহের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত ও নিস্পৃহ থাকার পাশাপাশি নিজেদের ইলম, আকাইদ ও চিন্ত-াধারার স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা;

৫) উলুমে দ্বীনের সর্বাত্মক প্রসারতা দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দ্বীনি মাদরাসা কায়েম এবং সেগুলিকে দারুল উলুমের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে পরিচালিত করা।[১২০]

দারুল উলুম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য ঃ

পৃথিবীতে অসংখ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও পৃথিবী কোনকালে বঞ্চিত ছিল না। এতদসত্ত্বেও দারুল উলুম দেওবন্দে যে সকল বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ পাওয়া যায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে এমনটি পাওয়া যায় না। হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র.) দারুল উলুমের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন, তা হল :

১) বিশুদ্ধ দ্বীনি চিন্তা-চেতনার লালন ও দারুল উলুম দেওবন্দ মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় প্রাণশক্তি অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান নিজের সকল কাজে ধর্মীয় অনুশাসনকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে আসছে। এ কারণেই এখানকার সকল আকাবির ও আসলাফ ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছেন ।

[১২০] মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, (ঢাকা: শাহি ধারা প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১১৪-১৫।

২) প্রভাবমুক্ত চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন দারুল উলুম দেওবন্দ ইসলামের চিরন্তন আদর্শ ব্যতীত ভিন্ন কোন সভ্যতা কিংবা ভিন্ন কোন সংস্কৃতির গোলামী থেকে পূর্ণ স্বাধীন। এর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাপনা, অর্থ যোগাড়ও ব্যয়ের পদ্ধতি সকল কিছুই পর সভ্যতার প্রভাবমুক্ত। পৃথিবীর মধ্যে এটিই একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার কাছে সরকার বহু বার লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদানের আবেদন করেছে কিন্তু প্রতিষ্ঠান এ আবেদনকে কখনো মঞ্জুর করেনি।

৩) সরল ও মেহনতী জীবন যাপন ও দারুল উলুম দেওবন্দ তার সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে সংগ্রামী জীবন যাপনে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা সহ্য করতে অনুপ্রেরণা দেয়। তাদেরকে সফল ও মেহনতী জীবন গড়ে তুলতে ইলমীভাবে সাহায্য করে।

৪) উন্নত চরিত্র গঠন ও দারুল উলুম তার ফুযালাদেরকে নিজেদের মহান আকাবিরের অনুসরণে আদর্শিক জীবন ও চরিত্র গঠনে অনুপ্রেরণা দেয়।

৫) শিক্ষা ও জ্ঞানানুরাগী জীবন গঠনঃ দারুল উলুম দেওবন্দ তার সংশ্লিষ্টদেরকে শিক্ষা ও জ্ঞান অনুরাগী জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি, তার বিকাশ দান ও বাস্তবায়নে প্রেরণা যুগিয়ে থাকে।[১২১]

৬) বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্তন ও যেহেতু দীনকে তার প্রকৃত ও বিশুদ্ধ রূপরেখায় সংরক্ষিত রাখার মহান লক্ষ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু এর শিক্ষা ব্যবস্থাটিও হবে একটি বিশেষ প্রকৃতির। দ্বীনকে সঠিক উপলব্ধি করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর সমন্বয় আবশ্যক। বলা বাহুল্য, দারুল উলুমের শিক্ষা ব্যবস্থায় উপাদানদ্বয়ের সুসমন্বয় বিদ্যমান। দারুল উলুম তার সকল তৎপরতার মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ। উপাদান দুটির প্রতি সর্বদা সযত্ন দৃষ্টি রেখে এসেছে।

৭) আমলী উৎকর্ষ সাধন ঃ দারুল উলুম দেওবন্দ কেবল বিদ্যা প্রচারের জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠান নয়, আমলী ভাবে এ জ্ঞানকে নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রও বটে। এখানে শুধু জ্ঞান ও বিদ্যা সরবরাহ করা হতো না, বরং আমল ও আখলাক, এশক ও মুহাব্বতের তা'লীমও প্রদান করা হত।

৮) অনাড়ম্বরতাঃ দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের জীবনে কোন আড়ম্বরতা ছিল না। ইলমীভাবে দেশ ও জাতির অসামান্য কল্যাণ কাজে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ উৎসর্গিত করেও তারা সর্বদা বিনয়, ত্যাগ ও অনাড়ম্বর জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন।

৯) প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি মুক্ত চিন্তাধারা ও দারুল উলুম মানুষকে ইসলামের ন্যায়ানুগ চিন্তাধারা ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের প্রতি আহবান করে আসছে। দারুল উলুমের চিন্তাধারা ও আমল আখলাকের ক্ষেত্রে কখনো কোন প্রকারের প্রান্তিকতা কিংবা বাড়াবাড়িকে সমর্থন করেনি। বন্ধুর বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুর শত্রুতার কারণে কখনই তাদের এই নীতি লংঘিত হয়নি।

---

[১২১] মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, গুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬।

১০) সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি ও দারুল উলুম কখনো ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলে তার আবশ্যিক দায়িত্ব উপলব্ধি করতে অলসতা করেনি। দেশ ও জাতির সেবায় সকল প্রকারের ত্যাগ ও কুরবাণীর জন্য এই প্রতিষ্ঠান সর্বদা ছিল সতর্ক।[১২২] উল্লেখ্য যে, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় শুরু বছরে প্রায় ২১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। বছরের শেষ প্রান্তে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮।[১২৩]

এ মাদরাসার প্রথম ছাত্র ছিলেন মাহমুদ হাসান। যিনি পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট সফল রাজনীতিক ও এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (মুহতামিম) নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা ও পরিচালনাকালে এটি উন্নতির শিখরে আরোহন করে।[১২৪] আর প্রথম শিক্ষক ছিলেন মুল্লা মাহমুদ। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্তা মসজিদে অসঙ্কুলান হয়ে পড়ে এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে দেওবন্দ জামে মসজিদে উক্ত মাদরাসাটি স্থানান্তরিত হয়।[১২৫] ছাত্র সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় জামে মসজিদেও স্থান অসঙ্কুলান হয়ে পড়ে। তাই আবাসিক এলাকা সংলগ্ন ছাত্তা মসজিদের পাশে ২রা জিলহজ্জ ১২৯২ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে মও-লানা কাসিম নানুতবীর নেতৃত্বে দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।[১২৬] দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ এর জন্য যে সব নিয়ম কানুন তৈরী করেন তার মূল কথা হচ্ছে এই যে, কোন অবস্থায় দেওবন্দ মাদরাসা কোন রকম সরকারী সাহায্য গ্রহণ করবে না। অল্পকালের মধ্যেই দেওবন্দ ইসলামী শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সমগ্র ভারত বর্ষ এমনকি তার বাইরে থেকেও ছাত্ররা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে।

প্রতিষ্ঠানটির ইংরেজ শাসন বিরোধী ভাবধারাও অম্মচন থাকে। দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাথীদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধ ও আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, তাদেরকে মন মানসিকতার দিক থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সহ সর্বপ্রকার বাতিলের (অসত্যের) বিরুদ্ধে সচেতন করা ও প্রতিকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার সৈনিক রূপে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।[১২৭]

দেওবন্দ আন্দোলনের গুণগত দিক পর্যালোচনা করে শায়খুল হিন্দ বলেন, তখন দারুল উলুমকে দিনের বেলা দেখা যেত একটি মাদরাসা হিসেবে। যেখানে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, উসূল ও আকাইদ বিষয়ক ইলমে যাহির শিক্ষা দেওয়া হত। আর রাতের বেলা মনে হত একটি খানকাহ যেখানে যিকর-আযকার, রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে নাফস ও ইলমে বাতিনের প্রশিক্ষণ চলছে।[১২৮]

---

[১২২] মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

[১২৩] ড. এ.এইচ.এম মুজতবা হোছাইন, "শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (র.): ইসলামী সাহিত্যে তার অবদান", (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৫।

[১২৪] প্রাগুক্ত।

[১২৫] মুহাম্মদ আয়্যুব কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী, (করাচী: ১৯৬৬), পৃ. ১৮৩-৮৪।

[১২৬] মুফতী আযীযুর রহমান, তাযকিরা মাশায়খ দেওবন্দ, (করাচী: ১৯৬৪), পৃ. ১৮৯-১৯২।

[১২৭] ড. বদিউজ্জামান, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, ঃ জীবন ও সাহিত্য (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ১৫।

[১২৮] ডঃ মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

একাডেমিক দিক থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তাধারা ও আদর্শের পরিচয় দিয়ে হাকীমুল ইসলাম। হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব বলেন

دينا سلم ، فرقة أهل السنة والجماعة مذهبا حسننى ،
مشربا بسوفي ، ملاا اشعرى وماترسيدى ، مسلوكا
جشنى ونتشبندى ، نكرا ولى اللهي ، اصولا ماسمى،
فروما رشيدي ، اجتماعية محمودى أور نسية دسبونبدى

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী (র.) প্রধানত দারুল উলুম দেওবন্দের মৌল কাঠামো নির্ধারণ করে। দেওবন্দ আন্দোলনকে উসুলীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) কাঠামোকে সর্বদিক থেকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার কাজ করেছেন। উভয়ের (মাওলানা নানুতবী ও মাওলানা গাঙ্গুহী) যুগপৎ প্রচেষ্টায় দেওবন্দ আন্দোলন জাহেরী ও বাতেনী (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন) উভয় দিকে পরিপূর্ণতা অর্জন করে।[১২৯]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি দারুল উলুম দেওবন্দের মহান প্রতিষ্ঠাতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আদর্শ সচেতন একদল কর্মী তৈরী করে তাদের মাধ্যমে আন্দোলনের ধারাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া সহজ হবে। তাই দারুন অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মাঝেও কোন সরকারী সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং মুসলিম জনসাধারণের স্বতঃস্ফুত সাহায্য সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে তারা নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুললেন এ প্রতিষ্ঠানটিকে ফলে অল্প দিনেই এর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বলা বাহুল্য যে, দেওবন্দ আন্দোলনের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

[১২৯] আবদুল ফাত্তাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।